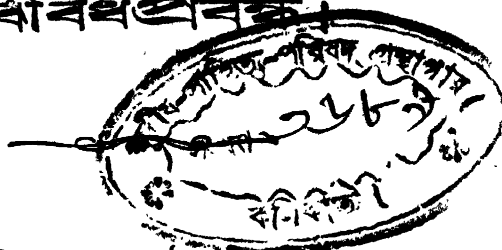
বিবিধপ্রবন্ধ।



বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

HARE PRESS:—CALCUTTA.

1896.

মূল্য ১॥৵ দেড়-টাকা।

PRINTED BY R. DUTT,



46, BECHU CHATTARJEE'S STREET,
PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,
5, PRATAP CHANDRA CHATTERJEE'S LANE.



বিজ্ঞাপন।

ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি প্রবন্ধ "বিবিধ সমালোচনা" নামে ও অপর কতকগুলি "প্রবন্ধ পুস্তক" নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।

দুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া "বিবিধ প্রবন্ধ" নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে "বিবিধ সমালোচনা" এবং "প্রবন্ধ পুস্তকে" প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে।



সূচীপত্র



বিবিধপ্রবন্ধ

উত্তরচরিত।

উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রাম কর্ত্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পথায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না যাহা একবার বাল্মীকিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়া-

ছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব্ব কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন —কোন্ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্বলেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য, যে কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ্ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্ব্বাসনবৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তিনি তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে

* "ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।"
প্রস্তাবনা।

অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ * বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।

উত্তরচরিতের "চিত্রদর্শন" নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠক সমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই "চিত্রদর্শন" কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী,

* "দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥"
সাহিত্যদর্পণে।

বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু ;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নীবিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে! যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,

———"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"*

যাহার পক্ষে—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥" †

---

* "এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি, কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্ত প্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

এই প্রবন্ধ নৃসিংহ বাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতএব সে অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে।

† "কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণ স্বরূপ, কর্ণের অমৃত

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,—

"আবিবাহসময়াদ্‌গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যয়া,
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥" *

যার পত্নী—

——"গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ।" †

তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করাল কাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্প-

স্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধ স্বরূপ।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩১ পৃষ্ঠা।

* "রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্ব্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।" ঐ-৩১ পৃষ্ঠা।

† "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ, ইঁহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইঁহারই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহার স্বরূপ।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

পরিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত, এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রামসীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা গর্ভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্রদর্শন" কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাব-মাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন, তখন সীতার কেবল—

"হোতু অজ্জউত্ত হোদু—এহি পেক্খদু দাব দে চরিদং"—

এই কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলা-বৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

"অম্মহে দলন্তণবণীলুপ্পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেণ দেহসোহগ্গেণ বিম্হঅথিমিদতাদদীসমাণসোম্মসুন্দরসিরী অনাদরক্খুড়িদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদো।"*

---

* আহা! আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহসৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর!

যখন রাম সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন—

"প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
র্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃতমধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ।"*

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন—

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥"†

যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন—

"অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদা-
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥"‡

---

* "মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অনতিনিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তলমনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণ-সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদাদি অঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

এই কবিতাটি বালিকা বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত।

† "একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।"

‡ "যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্ তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক আর

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,—

"ভোদু সে কুবিস্সং জই তং পেক্খমাণা অত্তোণো পহ্‌বিস্সং।"*

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, "বচ্ছ' ইঅং বি অবরা কা?"—মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—"স্মরামি! হন্ত স্মরামি!" মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিত করণ ইত্যাদি। সূর্পণখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

"সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং।

রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ।

সীতা। যহা তহা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই।"†

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমা-প্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমা-

---

দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে স্থাপিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

* হোক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।

† সীতা। হা আর্য্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।

রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।

সীতা। যাহাই হউক না—দুর্জ্জন হলেই মন্দ ঘটায়।

প্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রাগুলি একত্র করেন; সুন্দর সামগ্রাগুলির সঙ্গে তদায় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপনাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রা আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্র করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন, যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে, কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যারূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী, এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

"বচ্ছ এসো কুসমিদকঅম্বতরুত্তগুবিদবরহিণো কিন্নামহেও গিরী, জথ, অনুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং

মুচ্ছন্তো তুএ পরুণ্ণেণ অবলম্বিদো তরুতলে অজ্জউত্তো আলিহিদো।" *

দুইটি মাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র সৃজিত করিলেন!

চিত্রদর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ-সংবাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষগুলিও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা, তাহা বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃকথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন।—যথা বালিবধ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতাবিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র

* বৎস, এই যে পর্ব্বত, যদুপরি কুসুমিত কদম্বে ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্যপুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের পরিশেষমাত্র ধূসরশ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্যশাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম। গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জন-প্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস্ কৃত আত্মপুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ। যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়ন্দিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীয়র ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"*

* "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন,

"নতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্তারাধনা ব্রতম্।
যৎ পূজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা॥"*

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে সীতা পবিত্রা,—

"অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।"

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পতি-মাত্রজীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উত্তর চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন, যে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—

* "লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ; কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ ;—

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনি! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!"*

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃতি শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে কেবল

* হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি, বশিষ্ঠদেব এবং অরুন্ধতী সদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে। হা রামময়জীবিতে! হা মহাবনবাসপ্রিয়সহচরি! হা মধুরভাষিণি! হা মিতবাদিনি। এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল।—নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছাও গেলেন না,—মাতাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতাবিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-সূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্ম্মাণি কৃন্তন্তি" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

"তৈস্তেবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্॥
সর্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যান্ শত্রুসূদনঃ॥

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতং॥

* * *

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতং॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখং বীক্ষ্য চ তস্য তে॥
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ॥
ভবন্তো মম সর্ব্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ॥
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পবিনিষ্ঠিতাঃ।
সংভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ॥
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্যতি॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা॥

পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ।
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুনাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥

* * *

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ॥
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে।
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।
অকীর্ত্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ॥
পতত্যেবাধমাল্লোকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে।
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে॥
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ॥
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকং।
শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ॥
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন॥
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কথঞ্চন॥
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যবিচারণা।

অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয্যেতৎ প্রতিবারিতে ॥
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ।
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন।
অহিতা নাম তে নিত্যং মদভিষ্টবিঘাতনাৎ ॥
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ।
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম ॥" *

* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে ?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এইরূপই বটে—সংশয় নাই।" তখন শক্রদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে শুভলক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শক্রঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপন পূর্ব্বক মহা-বল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর" এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ, আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম, ক্ষত্রিয় মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজা কি বলেন" ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্কমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজন মধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্ত্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত হইবে তাবৎ সে অধমলোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজনীয়। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে!

ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

"রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥
তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ দেবীং দূষয়ামি।"

তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরম অপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু-খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

[সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্]
অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্।

[উত্থায়]। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ অসারঃ সংসারঃ কষ্টপ্রায়ং শরীরম্ অশরণোঽস্মি কিং করোমি কা গতিঃ। অথবা

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্ব্বজ্রকীলায়িতং স্থিরৈঃ॥

হা অম্ব অরুন্ধতি, হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ, হা ভগবন্ পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখ সুগ্রীব, হা সৌম্য হনূমন্, হা সখি ত্রিজটে মুষিতাঃ স্থ পরিভূতাঃ স্থ রামহতকেন। অথবা কস্চ তেষামহমিদানীমাহ্বানে।

তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোঽহম্।

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা-
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্।
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

[সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা।] দেবি দেবি অয়ং
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ
[ইতি রোদিতি।]" *

ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্য-বীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া,

* হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; যিনি গাঢ় প্রণয় বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে, মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছলক্রমে, করাল কাল-গ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায়, এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদান-স্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়। এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি, (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তও কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবান্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন বিশ্বামিত্র! হা ভগবান অগ্নে! হা নিখিলভূতধাত্রি

আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। * তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য, যে উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য দৃশ্যচিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যানে কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে কে কি

ভাগবতি বসুন্ধরে। হা তাত জনক। হা পিতঃ (দশরথ।) হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ। হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ। হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব। হা সৌম্য হনুমন্। হা সখি ত্রিজটে। আজি হতভাগা পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগা এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে হেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল। (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটী দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইণ্টর্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে শম্বূক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্য মধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বূক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ব্বে একটী একটী বিষ্কম্ভক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখনও প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা ;—

"অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘ্যেণ মামুপতিষ্ঠতে।" *

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥" †

হরেস্ হেমান উইল্‌সন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন

---

* অহো। এই বনদেবতা ফলপুষ্প পল্লবাদির দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

† গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে ; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

ভাষাতেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণ-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বূকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শম্বূককে পাইলেন, এবং খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বূক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বন-বর্ণনা অতি মনোহর।

"স্নিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥"

"এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ডশ্বাপদকুল-সঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্তদীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

তথাহি

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোরভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

* * * * * *

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্ব্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহুলচ্ছায়তরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ॥" *

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

---

* এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝর্ঝরশব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতেছে; কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিকে চলিতেছে। এ সকল সর্ব্বলোক-লোমহর্ষণ—অত্র গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জ্জন পরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গম্ভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিশ্বাসে অগ্নি প্রজ্বলিত। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মরকত ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘননিবিষ্ট

শম্বূকবিদায়ের পর পুনরাগমন পূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥
এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥" *

নীলপ্রধানকান্তি, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষ সমূহে শোভিত; এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথেপরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নিঝরিণী সকল বহুস্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধি এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্বফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকার শব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

* এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচক-কুলের ঘূৎকারশব্দিত বায়ুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ. পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক নায়িকাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে নাটকে বর্ণিত ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য, এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্য্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষত: প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্বপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোধিক। গোদাবরীসংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতা-বিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালসহকারে সে

কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বদরীবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতকুহরে গোদাবরী বারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই. সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা কাল সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

"অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ।" *

এইরূপ মর্ম্ম মধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সেই কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কতকাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশবৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরী স্রোতঃস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলি দেখিল যে আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, 'ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বড় বিপদ। দেখিও রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু মৃদু তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এক শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে

* অবিচলিত গম্ভীরত্ব হেতুক হৃদয় মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্র মধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন "ছায়া।"—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রাবশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়া-রূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল কপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শরদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বৃন্তবিচ্যুত কিসলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান বন-দেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করা-

ইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করি-
শাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক
মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা
তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়া-
ছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্ব্ব-
নাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!"
স্বর সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই
বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল পুত্রীকৃত হস্তি-
শাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্য-
পুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্যপুত্র? কোথায়
আর্য্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা
মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে
লাগিলেন। এদিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগ-
স্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেই
খানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্চ্ছিতা
সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা
ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন! বলিলেন, "এ কি এ? জল-
ভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল?
আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দ-
ভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু
জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা একটা
অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া
উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট?
আমি যে স্বরেই চিনেছি আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতে-

ছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কখু সো রাআ"— "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ত্রুটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কখু সো রাআ"—এই রূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ত্রুটি হইতেছে না।" কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, "সীতে! সীতে!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাচাও!"

তমসা বলিলেন, “তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন!” শুনিয়া সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!” এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। * রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী বনদেবতা বাসন্তী সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সমাগমের পূর্ব্বে করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয়

---

* “যা হউক তা হউক।” এই কথার কত অর্থগাম্ভীর্য্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, “আমার পাণি-স্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণি-স্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক।” কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক।” সীতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিস-র্জ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম,—আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়। যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, “ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম-জইদাব মং পেক্খিস্সদি তদো অণব্ভণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহা-রাও কুবিস্সদি।” তদ্ “মম মহারাও।”

করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

"যেনোদ্গাচ্ছবিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎ কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥

সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥" *

এ দিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজপুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নহেন—পুত্রমুখদর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

---

* যে নবোদ্গত মৃণাল-পল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলী পল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যাণভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি, দেখ, বাছা কেমন নিজ কান্তার মনোরঞ্জন-নৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডূষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনী-পত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

"মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধবলদসণুজ্জলকবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ।" *

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায়, একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে, পূর্ব্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব্বে পঞ্চবটিবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন, যে সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি

* আমার সেই পুত্র দুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না।

দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল সীতা তাঁহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া,—সীতানির্ব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কাণে গেল না —তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকর-কমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিস্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের, কুশল"। এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বাসন্তী তখন রুদ্ধকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে?

'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে —

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে তাহাকে—" বলিতে বলিতে সীতা-স্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। অচেতন হইলেন।

রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।"

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতা-বিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন, সহজেই রামের শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ,—তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।—মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখিলেন যে সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্ একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্মরক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধ-রূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বন মধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জন-দুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।" *

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন; "চণ্ডি জানকি, এই যে চারিদিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া

* সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া

কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারি দিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম!" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতা প্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞানলাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ

রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ ঘূর্ণায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন!

তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি বাসন্তি! বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল!"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মর্ম্মভেদী প্রলাপবাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, তাহাতে আবার এমন করে এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন?

রাম বলিলেন, "সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্নেহাদ্র সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিন সদৃশ, বর্ষাশীকরতুল্য শীতল কোমল লবলী বৃক্ষের নবাঙ্কুর তুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি!"

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসন্তাব-সৌম্যশীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃত-শীতলসুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শ-

মোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না ; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি একবার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লইয়া স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইঁহার প্রতি এই অনুরাগ!"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কই, কোথা সীতা— সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র যে চলিলেন!" তমসা বলিলেন, "চল আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই দুর্ল্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল। রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! এখন তুমি 'তুমি' হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগলজ্জাশল্য

বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "ণমো ণমো অপূর্ব্বপুণ্ণজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণ-কাল জন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র।"

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রামসীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, যে অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচনে ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে,

যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয়দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্বহরণ করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেই-

রূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, "স্তনয়িত্নুরবাদিভা-বলীনামবমর্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।" * তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে ;—

"দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্।" †

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহুসেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে মাম্?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

---

* যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ।

† সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উদ্যত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাৎ অনুসৃত হইয়া, ইনি, দুই দিক্ হইতে বায়ু-সঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনু-শোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

লব কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগবর্ণনা অস্বভাবিক, অতিপ্রকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—

"পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
নীলম্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব ॥" *

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ!" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধরমিথুন, গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া

---

* পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত

উঠে।” ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভক মধ্যে ঐরূপ দীর্ঘসমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি ;—

“অবিরলললিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্ততিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।”

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি ;—

“উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতবস্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ।”

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্রসৃষ্ট মেঘ ;—

“অবিরলবিলোলধুম্রস্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।”

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা ;—

“প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবাববিশ্বগ্রসনবিকচবিকরালকালকণ্ঠকণ্ঠকন্দরবিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।”

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনাদোষ মধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ।

এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্ত্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেন না ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসংবাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামাজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা, ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গ মধ্যে ছিলেন।

সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবী কর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন. "ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম?" নটদিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জল মধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন! দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতী কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন "উঠ, আর্য্যপুত্র!"

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোকসমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণরসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীত হয়েন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই "সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন

রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ-দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্ব্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতম্॥

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মণামনুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাম্॥
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ॥
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥
ইমৌ তু জানকী পুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ন্তব দাস্যতি॥

তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টির্বিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যৎ
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জনতা মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীম্॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে॥
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ।
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ॥
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ।
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ॥
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।

প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ।
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ।
তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা ॥
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী ॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতম্ ।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥
ধ্রিয়মাণং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্ ।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ ।

সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্ ॥
এবং বহুবিধা বাচোহন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥ •

• সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক ঋষি সকলকে আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপবংশোদ্ভব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ড, মহাযশা মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত, ও মহাযশা গৌতম এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণসকল কুতূহল বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন। •

মহর্ষি বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শনার্থ স্তব্ধবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতা সহিত শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি।

রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতি মহৎ শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জন সকলের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিলে।

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। "হে দাশরথে! ধর্ম্মচারিণী সুব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত, তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন; তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না; ইঁহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছি; যদি এই জানকী দুশ্চারিণী হয়েন, তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কায়মনে এবং কর্ম্ম দ্বারা আমি পূর্ব্বে কখনও পাপাচরণ করি নাই; যদি জানকী নিষ্পাপা হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পঞ্চভূত ও ষষ্ঠ স্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা শুদ্ধচারিণী, লোকাপবাদভীতা

এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক এক খানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না।

তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন। হে রাজনন্দন! যে হেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।"

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। "হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছিলেন তজ্জন্যই আমি ইহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক।"

অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন, এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, বায়ুগণ, সকল সাধ্যগণ, দেবগণ, সকল পরমর্ষিগণ, নাগগণ, পক্ষিগণ,—সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ ঋষিগণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পবিত্র ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্ধশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শন জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।"

তখন দিব্যগন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ব্বপাপপুণ্যসাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্ত্র-পরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলী হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন। "যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চ্চন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। 'আমি রাম ভিন্ন জানি না,' আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।"

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্যরত্নালঙ্কৃত নাগগণ কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত, দিব্যকান্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহু দ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন।

সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ

তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেইরূপ মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট, যে তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যে এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

হঠাৎ উত্থিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া অন্তরীক্ষগত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, "সীতা সাধু সীতা সাধু যাহার এইরূপ চরিত্র" ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ, ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহারা বা ধ্যানিস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে, সমাগত সেই সকল ঋষি প্রভৃতির, সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া, এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টম্‌সনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, উৎকৃষ্ট বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না তদুভয় মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকা লেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই, কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ্ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ মধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যে প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের

প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিত হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এদেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্যকাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না, এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি? * কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্পিন্' খেলার একই দর।

কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি-বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্ত-শুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব। ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেন না চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট; যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।"

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃপুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে —কেন না লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার

প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হই-য়াছে, ততদূর, কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা, বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারী কর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক, যে উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এজন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানু-কারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানু-

কারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটী পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ-সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এইরূপ যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিন খানি নাটক পর্য্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি

অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব; এবং সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে অপেক্ষাকৃত পর-সাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতকদূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন; সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড়পদার্থকে রূপবান্ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া

উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্কে। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্ল্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি এ কালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রসশব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য-চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়িভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়িভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি, একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়িভাব নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজ আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তি প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোথিতা কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপবিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে জলভরিদমেহথণিদগম্ভীরমংসলো সুদো ণু এসো ভারদীনিগ্‌ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মাবেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎসংসার

সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানব-মনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রাম-বিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত,আর কয় খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্‌দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্যপ্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটক খানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ—সেই খানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য

দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও এই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতি চমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাস-বহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও, সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতি মনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইল্‌সন্ বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য-দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

গীতিকাব্য।*

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন

* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা।

বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনা-বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্য-কাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গণে অভি-নীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত, এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরিউক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রথিত অসঙ্খ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাট-কের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred", "Faust," ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা, ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেক্টে বলিয়াছেন যে

প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor" কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রথিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold" কে ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায়, যে কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি; স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত-রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই

আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য *। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যে টুকু অব্যক্ত থাকে, সেই টুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যে টুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য,

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্র বাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই।

নাটক এবং গীতকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে, যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইয়াছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক-মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে দেস্‌ডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন

নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ, বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানু-সন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পর সম্বন্ধীয়, বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুসঙ্গিকতা বশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত।

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহাব সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ, প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য সকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র-বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্ত্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া থাকি, যে নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্,

তথ... ... আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেন না আমরা আগেই জানি যে এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্বকবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই, যে তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না কবি মানুষিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই; এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরেজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost

নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্‌টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্‌টন কোন পক্ষকেই সম্যক্ প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও, লোক-মনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন না। আনুপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌-টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈব চরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃতি; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্র-

দায়ের লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তা-বিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায়, কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর, বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই, কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্ব্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়-সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্ত-শুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে, পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্রপ্রণয়নে তিনি মিল্‌টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে

গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে, কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন্‌ অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি কবিতার্দ্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত "Like the bud bit by an envious worm" &c. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুম-সুকুমার।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন। তাহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারত-চন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ

বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্‌ঝটিকা রূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোম্‌ৎ বিজ্ঞান-সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকার-ভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই. এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্লের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি ? তাহা জানি না,

কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত ;- তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত ; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে ? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহুকালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি, ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল ; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন, উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল, যে সাহিত্যরসগ্রাহিনী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতা-

প্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসাদির কাব্য নাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, যে তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জলবাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতী-প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাৎ ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব-হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক-দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতো-ন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করি-তেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব,

বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহাদের কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়-

শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্বকবিগণ, কেবল আপনাদিগকে চিনিতেন, আপনাদিগের নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ —জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর; তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই

ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাশক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.



আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প। *

একদল মনুষ্য বলেন, যে এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা সুখাভিলাষী তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ; ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও —ঘটী বাটী পিত্তল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান•

* সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণি প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০।

রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে নাই বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণজলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষানিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষানিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যে টুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষানিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ, পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ, চির নূতন, এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয়সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায়-বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধ-শিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ-চূড়ামণি গ্লাড্‌ষ্টোন, স্কট্‌লণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউম্, আদম, স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়ণ্টর স্কট্‌কে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্প-বিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতক গুলির কেবল বর্ণমাত্র আছে—আর কিছু নাই; যথা আকাশ।

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে যথা; পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি, ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী,—বর্ণ, আকার, গতি, রব, ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দেওয়া হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।

স্বীকার করি, সকল দোষ টুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান সন্ততি লইয়া গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাব বশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র্য জন্য। সৌন্দর্য্য অর্থ-সাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও, সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ; যে ধর্ম্মানুসারে, উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্মশিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায়, কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল,

নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম-বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত—সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদন-সুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

দ্রৌপদী।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা কোমল-প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও, যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না মহাভারত অনন্ত সাগর তুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ, যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী-কুসুম শুকাইয়া উঠে। সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ, দুর্য্যোধন,

জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন, যে কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন,

কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি সেই প্রচণ্ড প্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ তুল্য পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এ স্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাঘাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায়, বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও, কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব

নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাব-সিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রের দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারত কার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন। ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়ের চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায় এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধ মাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্ম-শক্তি নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বল-

বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র সাগরের তল-পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! হা রমা-নাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর! এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও সামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই প্রবলতর দর্পের মান-দণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট

তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সংকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধুসৌবীরাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিলেন

না ; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্য-মান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃ-শঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

দ্রৌপদী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদীচরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয় সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চস্বামী, অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ পদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চপাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক্, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথা গুলা বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল।

ামার এই বিশ্বাস হইয়াছে, যে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে াহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত, বেদ স্মৃতি দর্শন রাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ রার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই ইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ পায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা াঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই, যে প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে প্রাচীন ভারত-

বর্বীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী. দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক ইহা সিদ্ধ হয় না। যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে—এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবি স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া

স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চপাণ্ডবের মহিষী ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্র মধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এককালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে মনুষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ, যে এরূপ প্রথা ছিল না, কেন না দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত লোক-নিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবি এমন একটা কথা, তত্ত্ব-বিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর

পঞ্চস্বামীর ঔরসে পঞ্চপুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহারও ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি, কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র—কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি,তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরাই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন। তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন "Tut ! clear case of polyandry !" তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্রকে" লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, এ কথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারত-প্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারত গ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়. মহাভারতরচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত বল তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাই-

য়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যত দূর সম্পন্ন হইতে পারে, তত দূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তির নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ।'

এই "নির্লেপ," বৈরাগ্য নহে, অথবা সাধারণে যাহাকে "বৈরাগ্য" বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিস্প্রয়োজন। এবং বর্জ্জনে সংলেপই বুঝায়। বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য,

---

এডুকেশন গেজেট, ১৮ই বৈশাখ, ১২৯৩ সাল।

যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধনপ্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ-ধর্ম্মের মূর্ত্তি স্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চপতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চস্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতর-বিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদীচরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতি দুঃসাধনীয়। মহাভারতকার

মাহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায়, যে দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম; গৃহীর তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল; না হইলে, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রের উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিষ্প্রয়োজন—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত; ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণের সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ভে ধারণ করিলেন; তৎপরে নির্লেপবশতঃ আর সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি, যে দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা; সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

অনুকরণ। *

জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক, "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ

* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন ; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্য বাঙ্গালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন,—এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল-উজ্জলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ড্সন্স্ সিলেক্সন্স্, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্যবাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশুচরিত্র-সাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি, যে আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন ?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট ? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে ; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফশলের যোগাড় করিয়া দিতেছে ; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম

রাখিতেছে; সমাজ-সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে চোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

কিন্তু যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—এ কালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এ কালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালি সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই—সে সকল কথা আজ-কালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত-জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের—বিশেষতঃ রোমকীয়ের—অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই, যে অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ডাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমক সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল, লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ,

মহাভারতে বিদুর ; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী ; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা ; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত ; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নী সহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে ; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে ; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্যবিন্ধনে পরিণত হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন ; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেরেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্ত-

নৈনদিগের রাজধর্ম্ম, কুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাটগণের স্থাপত্য-কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে: ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র, রোমক ব্যবস্থাশাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী: কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়: পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে শিশু প্রথমে লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে

এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ, অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ, সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐ রূপ করিত। বাঙ্গালির

স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্য্যবংশসম্ভূত; আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর;—ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, যে বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য; এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্ব পদার্থ যদি এক ধর্ম্মের হইত তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল

শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘু-বংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীস্থ চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব

সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কার্য্যবৈচিত্র্য, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে, যে অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক, বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্ব সকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল-সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সেস্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয়, যে অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিত-রূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শকুন্তলা, মিরন্দা, এবং দেস্‌দিমোনা।

——oo——

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণপথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদংবপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দ্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard,—and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I like several women;
——————but you, O you
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণী প্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘ বিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেননা তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আল-বালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন - সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে

লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! How it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল ; কেন না শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন-মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হই-লেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মির-ন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন ? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা

বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয় মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man I e'er saw ; the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু

মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any companion in the world but you;
Nor can imagination form a shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ:—

Hence bashful cunning!
—And prompt me plain and holy innocence.
I am your wife, if you will marry me.
—If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, যে মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়-সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন, যে "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর," মিরন্দাও এই স্থলে

সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই,কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে স্মুমরিঅ এদস্ম হত্থত্তংসিণো মিণাল বলঅস্ম কদে পড়িণিবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—

"নন্থু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" —এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জল-নিসেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিসেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য; রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্য হৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোষে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?" —সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

৫

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে, যে শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের একভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া কেননা, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাঁহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমি এ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্কং এব্ব চরিত্র কিংভণদু এক্কং এক্কস্ম॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার শরীরে স্বর্গারোহণ পথরোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানি-

ভেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামী কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার-পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেননা মনুষ্য প্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া কেন না উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজ কাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর, "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দি-

মোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে" তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্হে জ্জেব পরাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্থ।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী; ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবী শূন্য দেখিয়া ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

Alas. Iago!
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for, by this light of heaven
I know not how I lost him; here I kneel;

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ-শয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে, "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত-জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যু-কালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম, আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেস্‌দি-মোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুল-নীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দন কানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দন

কাননে অপৰ্য্যাপ্ত, স্তূপাকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক,হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুরনীলিমা,ইহার অনন্ত আলোক-চূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি,ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য-কাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেননা এরূপ উপা-খ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলে হয়।

আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেননা ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে দেস্‌দিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুবাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না —যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষু রালোহিতং,
বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্তইব বেপতে সকল ইব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমা-

দিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অৰ্দ্ধেক মিরন্দা, অৰ্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিণী অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

বাঙ্গালির বাহুবল।

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্ত বংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে দিগ্বিজয়ী গ্রাক জাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে সেই বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশত বৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালির পূর্ব্ববীরত্ব. পূর্ব্ব গৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি, যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদশালিনী নগরী সকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্য ভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত। (১)। কেবল ইহাই জানি যে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজখণ্ড সকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি, অমর, অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ্ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন, যে এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায়, যে পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ, বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে, যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

প্রথম। কিম্বদন্তী আছে, যে দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত, যে অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গ[illegible]ত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে (২)।

তৃতীয়। লক্ষ্মণ সেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায়, যে সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন; এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থসাঙ, সমতট রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন

(২) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall, p xxxv. Note 2.

তাহা পড়িয়া বোধ হয় পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্ব্বাকৃত, দুর্ব্বল-গঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি ?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে ভূমি উর্ব্বরা হইলে আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য, মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বরদেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে। (৩) আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য জানেন তাঁহারা তাপকে দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

(3) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial: and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England.

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on the average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statistical Summary.—page 5-6.

অনেকে মোটামুটি বলেন যে জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রজেন-প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন, শতভাগে দশভাগ থাকে; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ; (৫) এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে; (৬) সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি?

---

(৪) Johnstone's *Chemistry of Common Life* Vol. 1, p 100.
(৫) Ibid p. 125.
(৬) Ibid 101.

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি ?

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন্ দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না, যে অল্পকালে সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে, ইহাও বলা যাইতে পারে, যে এমত কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন কালে, এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে, যে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে, যে গোধূমাদির চাস এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি কালে জল বায়ুরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকায় অপেক্ষা

উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশ-বাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা —সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীতাতপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোম-নগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশদিন তাহাতে বরফ জমিয়া-ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং বণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত, যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে, বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল, যে ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত। এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে, বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্ন মাত্র নাই। লাব্রাডর, এক্ষণে শৈত্য-

ধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন। (৮)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন না দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এজগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার, ইউরোপ, আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে

(৮) *The Scientific American.*

আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে, সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, **শারীরিক বল বাহুবল নহে।**

মনুষ্যের শারীরিক বল, অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে, অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে,ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে, শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় আছে,

তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে, যে তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কাল মধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

ভালবাসার অত্যাচার।

লোকের বিশ্বাস আছে, যে কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে। ভাল বাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে, তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভাল-বাসে সে, যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গল-জনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী

নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন্য. যে তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে, আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।* যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে, যে সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না

* যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার চিকিৎসা করিবে না, বা যে অল্প বয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে অধিকারী। আর রাজার যদি এরূপ অধিকার, স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না।

ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্ব-তত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এবিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়,তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেননা এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়.কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে

বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলি-লেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করি-তেছে এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল। মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দু সমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য, যে কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেক গুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয়নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়,

সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না

হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া মনুষ্য, ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে. এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেননা অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচাব শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ, যে স্বার্থপরতা-

শূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শন মাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না তাহাকে স্বার্থ পরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্র মুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল; সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে মাতা স্বার্থপর, কেন না আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর. কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এইজন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্য প্রণয় এবং বাৎসল্য দাম্পত্য ব্যতীত, পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে, প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখ ভোগ ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ

বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না —তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি ?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পর সম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টী, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না ; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্ম শাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কার-নীতির সকল তত্ত্বের সহিত,এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিত নীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই, ভাল-বাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন, তাঁহার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করা উচিত, যে আমি কেবল আপন সুখের জন্য, হস্তক্ষেপ করিব না ; আপনার ভাবিয়া,

যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ দশরথকৃত রামনির্ব্বাসন, মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা. স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ, সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশঃ কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্য-পালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ, দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদ্‌কে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলি-বেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর, যে যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক তাহাই কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার তাৎকালিক বিবে-চনায় অনিষ্টকারক তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এস্থলে করিব না—কেন না হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্ম-নীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম-সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম-সংস্কার নীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকার-চ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা দোষযুক্ত যে অনিষ্ট তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং

ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না সর্ব্বজনীন প্রেম স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

জ্ঞান।

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে "ফিলসফি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞান বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তর বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্ব্বদা মনুষ্য সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র—যখন তুমি সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সুখ-লাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্যমতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্ত-দুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে,—আবার জন্মিতে হইবে,—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউ-রোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়—যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন দুঃখ থাকিবে। অত-এব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র

উপায়। সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে, ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব, আমরা কর্ণের

---

(১) গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ ঘ্রাণজ ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎ-সংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না

দেখিয়া,কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহ মধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু, যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয় তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে

পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারেনা এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই. এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান. লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ,— আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রথা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে. সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, কে বিশ্বাস-যোগ্য, কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা

ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অভ্রান্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য ; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, অলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয় তাহার সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য ইহা আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের

অবনতির একটি যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিক দিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা-ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। (১) অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, যে দর্শনশাস্ত্র

(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।

দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্যবুদ্ধি! যাহা এতকালে হুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে—দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা,—কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা, দুইটি সমান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন, "প্রত্যক্ষের দ্বারা! আমরা যত সমান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন যে, "জগতে যত সমান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই,—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে, কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে, যে কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে এক

স্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;—কস্মিন্ কালে কোথাও এমন দুইটি সমান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন, যে যেখানে বহির্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে

কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরীক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটি অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেই খানেই তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক বর্ত্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে, খও এখানে আছে, কেন না আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি যেখানে কারণ থাকে সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। সমান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য, কেন না আমরা যেখানে যেখানে সমান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেইখানে দেখিয়াছি মিল হয় নাই, অতএব সমান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে, যখন যেখানে দুইটি সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেই খানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।

শেষ মত, হর্বট স্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে

সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমন নহে—তাহা হইলে সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাহা কান্তীয় মতে স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞান স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন যে, ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (১)

---

(১) অনেকে কোমতের "Positive Philosophy" নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটি ভ্রম। যাহাকে "Empirical Philosophy" বলে, অর্থাৎ লক, হ্যুম, মিল, ও বেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

সাংখ্যদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সাংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীয় গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, একথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন, ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য

বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্নমূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে সে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং

সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া, সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে, এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্ত্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে "বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাংখ্য দর্শন" ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিণাম মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। *

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তৎপরবর্ত্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

---

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই" সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্য গ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই কাপিলসূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্ত্ব, সমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্য-প্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল, অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই

আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য ; এবং যাহা কাপিল-সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায় ?

আবার কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ —তাঁহারা বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার

অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক সেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদক-সেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্ট-কারী কার্ব্বণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানি-তেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলা-উঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্য-

জাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব ?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর এক জন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহা-রও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে, যে স্বাভা-বিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেও দুঃখ। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মা-নুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্য-দর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বী-কার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী, (৬ অধ্যায় ৭ সূত্র) এবং সুখ,দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (ঐ, ৮)

দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না। (ঐ, ৬) অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি-রত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যা-লোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাই-তেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি নাই; কেন না আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্র-শোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্ব্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে. আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না। (১ অধ্যায় ৪ সূত্র।)

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধু-নিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্‌তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক

করিলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জ্জ্বালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখনিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়, ৫২—৫৩ সূত্র) আত্মা, বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না, কেন না যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে। (ঐ, ৫৪)

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।" (তৃতীয় অধ্যায় ৬৫ সূত্র) সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। "অপবর্গ" ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত, বা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।—বিবেক।

আমি যত দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন, "তুমি" বলিব. এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা,সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন, যে আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, "মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল, সেই আত্মা।" এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উহাঁরা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শারীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতি ঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ অধ্যায় ১৫ সূত্র) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ, ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যা- ন্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জক ভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই, কেন

না তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে ; দেশ ব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুত্রনগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন ?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে, দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগে নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেই-রূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হই-লেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরু-ষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। (৬, ৭০)

সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক হয়, যদি আত্মাই সুখ দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহ-নাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই "যদি" গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই বলিবেন,—

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিসে জানিতেছ? শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখ দুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ দুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্ম-পুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু-মাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহা-রাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে অবিবেক সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই শক্তি" (Knowledge is Power) ; হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই মুক্তি।" দুই জাতি, দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে একপথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তির অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তি সকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ, দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্র

সকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক, এবং সূত্রগ্রন্থ সকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুসঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা, একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্ম পীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—সৃষ্টি।

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা একজন আছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে, কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ,এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্ তত্ত্ব. সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক তত্ত্ব। ঈশ্বর-

বাদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।"

এক্ষণকার কোন কোন খৃষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাঙ্খ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাঙ্খ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ), এইরূপ কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য একস্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে; কেন না কারণ শ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারেনা। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্যবৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাঙ্খ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১৭৬)

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব সংসার কি

প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাঙ্খ্যকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চতন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূলভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূলভূত। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান, অহঙ্কার। মহৎ মন। *

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এজন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এজন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে "আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হই-

* Mind নহে; Consciousness.

য়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে (Cogito ergo sum.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাঙ্খ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে তাহা এই সাঙ্খ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র।

বেদে কোথাও সাঙ্খ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় নাই। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, শতপথব্রাহ্মণে সৃষ্টি কথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টি কথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরেও অন্ততঃ বিষ্ণু, ভাগবত এবং লিঙ্গ পুরাণের পূর্ব্বে সাঙ্খ্যদর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাঙ্খ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ নূতন, কোন্ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে তাহা সাঙ্খ্যানুকারী।

সাঙ্খ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাঙ্খ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।—নিরীশ্বরতা।

সাঙ্খ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, যে সাঙ্খ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমুলর, এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্য বলেন, যে সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাঙ্খ্য নিরীশ্বর নহে। সাঙ্খ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন, যে ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাঙ্খ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাঙ্খ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই; "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, "যৎ সম্বদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখিবিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" অতএব যাহা সম্বদ্ধ নহে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রে

সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই—অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে ঈশ্বর নাই। যে বলে যে ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক্ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি। "কোন পদার্থ আছে এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে," ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,—তাঁহারা বলেন ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন এমত কোন প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন, যে ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে চেতনাদি মানসিক বৃত্তি সকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" শুধু এই কথার উপরে নির্ভর করিলে, সাঙ্খ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, যে ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথায়ও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত্র করিয়া, সাঙ্খ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্বসম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২) প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাঙ্খ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্য

ক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫, ১১)।

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে মানুষমাত্রেরই দুই হাত এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাঙ্খ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ, শব্দ। আপ্ত বাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাঙ্খ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত

নহে (শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য। ৫, ১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাঙ্খ্যকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। ১,৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন বদ্ধ,—তাঁহার পক্ষে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১,৯৩) উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১,৯৭)।

সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন, যে যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না

হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

অতএব সাঙ্খ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাঙ্খ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাঙ্খ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭ সূত্রে সূত্রকার বলেন, "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা"। সে কি প্রকার ঈশ্বর? "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা," ৩,৫৬। তবে সাঙ্খ্য নিরীশ্বর হইল কই?

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাঙ্খ্যকার বলেন জ্ঞানেই মুক্তি আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধলোকেও মুক্তি নাই, কেননা তথা হইতে পুনর্জ্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই. কেন না তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা।" ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। "সর্ব্বকর্ত্তা" অর্থে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বসৃষ্টিকারক নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বেদ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাংখ্য প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্ম পুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্ম্ম পুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এবিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদ শব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম, এবং অবস্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু; অশক্য, অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ সেই, সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ সে যে আশ্রমেই থাকুকনা কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদিগেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যেব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেথানে সেথানে থায়,

তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সর্ব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য তাহাও বেদ।

বিষ্ণু পুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম্ম, প্রবর্ত্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময়, ও ঋগ্ যজুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও আছে, যে বেদশব্দ হইতে সর্ব্বভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্‌সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদ হইতে অখিল জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

এইরূপ সর্ব্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ব্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে ইহা ঈশ্বরপ্রণীত সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুই খানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ স্থক্তে আছে, বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(২) অথর্ব্ব বেদে আছে স্তম্ভ হইতে ঋগ্ যজুষ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল।

(৩) অথর্ব্ব বেদে অন্যত্র আছে যে ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুষ, এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তি; ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক স্বষ্ট হইয়াছিল।

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতি সোমকে স্বষ্টি করিয়া তিন বেদের স্বষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ স্বষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদাদি সকল স্বষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, যে মনঃসমুদ্র হইতে

বাক্ রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, যে বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু।

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্ ও যজুষ; জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে সরস্বতী এবং বেদ বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ব্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে আছে, যে আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ব্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং আরণ্যকে, এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা

করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বেদ অপৌরুষেয়।
কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থ প্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে কাল আকাশাদি যেমন নিত্য সেইরূপ বেদ। ব্যবহার কালে কালিদাসাদি বাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গোতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্য প্রণীত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কিনা, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলি কর্ত্তা উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকারের মত সৃষ্টি ছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন, যে বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না, কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা "স তপোহতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত"। যেখানে

বেদেই বলে যে এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য বা অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন যে বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদ-সৃজন করিবেননা; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হইতে পারে, যথা অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। যাঁহারা হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহা-দিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্র, ভ্রান্তিও বিচিত্র। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমন বিবেচনা করি না। আমা-দিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদে অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল তবে আবশ্যক মত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরু-

যেয়ও নহে, একথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায়; যে "দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে, যে ইহা মনুষ্যকৃত, কেন না সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।" যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয় এত গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্ম্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি তবে কেন মানিব?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি

করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।" এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গোতম, কণাদ, কপিল যাঁহার যেমন ধারণা তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিক-দিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচার সময়ে মহারথী মীমাংসক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গোতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য-প্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন, যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা, অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোক পরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই; ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে প্রলয়পূর্ব্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে বেদকর্ত্তা কাহা কর্ত্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে বেদবাক্য সকল যেমন কালিদাসাদি বাক্য তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্ব হেতু, মম্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, যে যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন, যে মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল, যে মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস ইহা স্মর্য্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, যে "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।" ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্ত্তাও নির্দ্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন, যে শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে, কেন না শব্দ সামান্যত্ব বশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন, যে গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের

প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে ইহা গকার অতএক শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে সে প্রত্যভিজ্ঞান সামান্য বিষয়ত্ব বশতঃ যেমন ছিন্ন তৎপরে পুনর্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে বেদ অপৌরুষেয় তাহার এক কারণ যে পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তাল্বাদি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভূত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা নাই। যাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের

প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ব্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে তাহাও আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২। ৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম॥
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধোন বিধিয়তে।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবর্জ্জুন॥

৩। ভাগবৎ পুরাণে নারদ বলিতেছেন যে পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে বেদ ত্যাগ করে। ৪। ২৯,৪২।

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গ ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্।
যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠতম্॥

৪। কঠোপনিষদে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না—যথা

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন।"

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।*

---

* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেব কৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।

ভারত-কলঙ্ক।

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?

ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এইজন্য। "Effeminate Hindoos" ইয়ুরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়-দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহা-রাষ্ট্র এবং শিকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি, যে এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংস্য করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে, ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেক্‌জণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবনলেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক,

কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত, যে তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়-বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে, সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিন্ধু রাজপুত্রগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের

সাধ্য হয় নাই। এলফিনষ্টোন বলেন যে হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়-বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বাস্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর

মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচশত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারত-রাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্য-দিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায়, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।*

---

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণন কালে, তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ গ্রীক সৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানাজাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধু পারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত, আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলী-

ভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ,সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়,—গ্রীক লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় "ভাল

মানুষ" শব্দের অর্থ ভীরুস্বভাবের লোক—অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।"অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্ কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুরা ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে।

ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী

আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে,পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।*

* আমরা এমত বলি না, যে ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুতদিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়ই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম, ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া, কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে উভয়মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব এমত

আমরা বলি না ; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুজ্ঞের্য় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এজন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয় ; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্যসুখে অনাস্থা। বাহ্যসুখে

অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগকান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি-প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন,

তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেননা আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত, বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসিক, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্ব-প্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্য-কুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয়

কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ,—হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষিতার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য,আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এক রূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন

করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে,ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ

বলবৃতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। তাৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ডসমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ডা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত ভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজ-কুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যপর্ব্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষ-বাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে

লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে,বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে,নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালি বেহারী এক বংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই,শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদ জ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে

অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজ মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডাল্‌হৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত ?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা*। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।

---

* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না, যে তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে দুঃখই বা কি সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন

ভারত স্বাধীন,আধুনিক ভারত পরাধীন,একথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক, যে প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে,ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—"Liberty" "Independence," তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইজন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে, বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব

প্রাচীন বুর্বোবংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বর জাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ শাসিত ইংলণ্ডকে, বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহ জাঁহা শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে, যে শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ, স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমক-জিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক্ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভারত-

বর্ষে নাই। অন্যদেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহা-সনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটী স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌স, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হানোবর কি তথন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে প্রথম জেম্‌স্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাব সূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি,দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে,যথা নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য পারতন্ত্র্য জন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্য দেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন সেই সেই দেশের প্রতি তাঁহার

অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার। সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত তাহার সন্দেহ নাই, কেননা যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমচার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয়মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের

হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজা সকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসী-দিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চির-কালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবি-স্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজ-ব্যবস্থা নির্ব্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই দুই অংশে রাজ-কার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে, ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের উপরেও

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন এমত নহে। বোধ হয় আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশঃ ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত রূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক, বাবু তারা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়া ছিলেন, যে ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষ-পাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ, রাজা স্বজাতিকে দিয়া

থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণশাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ ইংরেজ, দেশী লোককে বধ করিলে, আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণ-রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন —"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ-রাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন

শূদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চপদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,— প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার কার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার কার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে. কেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে, যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে পরাধীন

ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাঁহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্য-পালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর একদিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্ন জাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী তাঁহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্র দোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড়

ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রযোজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি, যে আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি।



নারদবাক্য।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া

মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবন রাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন এমনও বোধ হয় না)। ইতিহাসে তিনজন সাম্রাজ্যনির্ম্মাতা বিশেষ পরিচিত—শার্লমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেক্‌জণ্ডর, নাপোলিয়ন, বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই, কেন না তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নহে। গজনবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্য এক এক জনের নির্ম্মিত নহে। কিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত। এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশ বাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে, যে রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ কবিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিকতত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এজন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। ঐ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন

তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য, দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়?*** নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?"

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব "আত্মানুরূপ" ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে নারদ-বাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দুরদৃষ্ট এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে —বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ। পরে,—

"একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্র ত জনপদ মধ্যে অপ্রচলিত থাকে?"

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, কেবল

অতিরিক্ত এই বলেন, যে "মন্ত্রণাবিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।" পরে—

"স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?"

আমাদিগের অনুরোধ যে প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,—

"কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।"

বিলাতী শাসনকর্ত্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

"অনারব্ধ কার্য্যের, পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?"

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্‌প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটী নিযুক্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে—

"সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?"

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই

পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন কাজে লাগে? মিল পার্লিমেণ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েষ্ট-মিনষ্টর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার বিনিময়ে দুগ্ধ-বতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে, যে "কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।" এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ;—দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন,' দুর্গ সকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে পরিপূর্ণ থাকেয়াছেন। তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল ত সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক কালযাপন করে?"

মিউটিনির পূর্ব্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন তবে তাদৃশ বিপদ ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স্ এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লাক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

"প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই।

"সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?"

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতীব রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

পরে, নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন,

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারেব নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণ পোষণ করিতেছেন?"

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে—

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?"

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন।

"অবিলম্বে" কাহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন "অবি-লম্বে" প্রূসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত "মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য" ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, নারদ বাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,—

"যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অব-লোকন করিতেছেন?"

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন।

নিম্নলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য;—

"সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহা-দিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন?"

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

"পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন?"

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য—

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষ দিগকে ত পরাজয় করিতেছেন?"

পরে,—

"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়-রূপে সুরক্ষিত করেন?"

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে, সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার কৃত রণজয় সকল বিফল করিয়াছিলেন।

"এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন?"

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটী বাক্যে সমুদায় রাজকার্য্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে—

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন?"

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা—

"আয় ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেথকবর্গ আপনার আয় সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে?"

আমরা জানিতাম এটী ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে?"

এই কথা, নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, "ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেণ্ট"টী ভারত-বর্ষে একটী নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন—

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনির-পেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে?"

একথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

"কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই। আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন?"

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না—অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ—বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায় সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্ত্র অনবগত সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। 'অর্থশাস্ত্র ঘটিত যে আপত্তি তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারত-কারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের ঐ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম—"আবশ্যক

হইলে" ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে যাহাকে না দিলে চলে না তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ "অনুগ্রহ স্বরূপ" দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাঙ্ক্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বঞ্চক জাতি সর্ব্বত্রই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ "শত-সংখ্যক" ঋণ দিবে—ইহার ঊর্দ্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণস্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঋণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটী নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।

নিম্নোদ্ধৃত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে;—

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজা-গণকে ত দর্শন প্রদান করেন?"

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না; বিশেষতঃ এদেশের

লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকল প্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা "লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে,—

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?"

তাহা হইলে দুর্ব্বল শত্রুও বলবান্ হইয়া উঠে। এই দোষে, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ "নিম্নদেশ" অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড যে আমেরিক উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ।

তৎপরে,

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্রসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না?"

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দ্দশ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাও শ্রবণযোগ্য,—যথা,

"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নির-

ন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।”

আর একটী বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—

“অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন কবেন ?”

এই প্রকার সারবান্ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে।

প্রাচীনা এবং নবীনা।

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা, নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। “এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে তবে আমাদিগের শালতরুও এক দিন ওক্‌বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সে গুলি চলিত হইল

না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা একপ্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহদান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গরু কেনা হইতে ফরাসিস রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস স্ত্রীগণ ফরাসিস রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট—

—Gospel light first dawned
From Bullen's eyes—

ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি ; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব কীর্ত্তন কালে, এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম ; কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুষ্যজাতি ; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয় ; স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভাশুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই, যে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক ; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে ; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্যভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে, এই ভ্রমে

পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে, পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজ-বিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই

কার্য্যকর্ত্তা ; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না ; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি ; কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব ; সহমরণ বিধি ; বহুকাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতি-সূচক ? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্ব

কালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দূরকোটা মনে পড়িবে ; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে পৈঁছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী ; কপালে কলা বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি ; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া, দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না, কেন না তাঁহারা "পোড়ার মুখো" "ডেক্‌রা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং "আবাগী" "শতেক খুয়ারী" প্রভৃতি আধুনিক "সখী" "ভগিনী" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই ; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লই-

য়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসা পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতাবেড়ী ঝাটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সূচসূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে: এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দ্দমরঙ্গিনীগণ, সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি, পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে: তত্তৎস্থানে সম্বোধন পদ সকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা, ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক

অনিষ্ট জন্মিতেছে ;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়, যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী ; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্ন শয্যা-শায়িনী হইলে, গৃহের শ্রী থাকে না ; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে ; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয় ; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয় ; এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহ্য করিতে পারে না ; সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে, যে তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ু-সেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগ শূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না ; এখন

নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উটান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন,

স্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে মরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী হাঁ হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা য়ন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই শৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক য় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্দ্ধেক দাস দাসী এবং পর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; াল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; াল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌর-নে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের ়পযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় ুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু

অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দা ভয়ে, তত ধর্ম্ম ভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনো-নিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনা-গণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বল-বতী নহে। ইংরেজী সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে, আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়ি-য়াছে; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসংকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এত-দ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার

একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটী যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু

তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দা-ভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; এজন্য ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সম কক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?*

তিন রকম।

নং ১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা

* "নবীনা এবং প্রাচীনা।" এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিন খানিতে লিখিত হইয়াছিল।

কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্ দিকে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ? কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন, পিতা মাতাকে; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোণার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন; কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে, তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ. ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ, সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে

ইংরেজ বাহাদুর, নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘূরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘূরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী. এক-দিকে শুঁড়ী, আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম্ম দড়ীতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরিব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখৃষ্ট? ধর্ম্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতা পরা মলবেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাথির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিঙ্করীকুল কোন্ দোষে দোষী? আমরা কি জানি?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালীর মেয়ে; জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরু-ভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে,

দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, যে অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি? ছি? ধর্ম্ম ভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্ ধর্ম্মে বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে

ধর্ম্মশিখা, লেখা পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

৩নং

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি "নবীনা এবং প্রবীণা" লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটী মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজলি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে

যাইব, কিন্তু তোমরা এ চল চল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে!—কপাল খানা! আবার বলেন কি না কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এর একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তাহার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখা পড়া শিখিয়া,—ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা, একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন থেঁটি পরিবেন; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে, আমরা, "দ্বিতীয় সংসার" করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে

না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগরী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না?

শ্রীরসময়ী দাসী।

